পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

পরিবেশ নিয়ে মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। পরিবেশ ও মানবজীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। মানুষের চারপাশের সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। কিন্তু মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ডের কারণে আজ পৃথিবীর পরিবেশ হুমকীর সম্মুখীন। শিল্পায়ন, জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর পরিবেশ আজ বিপন্ন। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গলে যাচ্ছে মরু অঞ্চলের বরফ। বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। এর বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশের মতো সমুদ্র উপকূলীয় দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থায়। পরিবেশগত সমস্যা এখন একটি উন্নয়ন সমস্যাও বটে। একারণেই অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। সরকার, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও পরিবেশ সাংবাদিকরা পরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে উৎপন্ন পণ্য ও সেবার প্রবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানবকল্যাণ এবং উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু উৎপন্ন পণ্য এবং সেবার নিরিখে প্রচলিতভাবে নিরূপিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু সম্প্রতি টেকসই উন্নয়নের ধারণা জোরালো হওয়ার পর এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের জীবন ধারণের মান নিরূপণে বস্তুগত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য প্রয়োজন বিকল্প পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অবচয় এবং পরিবেশগত বিষয়াদি যা টেকসই উন্নয়নে প্রভাব ফেলে, বিবেচনায় আনা হয়।

বিশ্বের পরিবেশ আন্দোলন

বিশ্ব পরিবেশবাদ আন্দোলনে স্টকহোম কনফারেন্স একটি মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পরিবেশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বৃহৎ পরিসরে দেখার সুযোগ করে দেয়। স্টকহোম কনফারেন্সে (UN Conference on the Human Environment) প্রায় ১১৩টি দেশ, ১৯টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রায় ৪০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। স্টকহোম কনফারেন্স এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কেনিয়ার নাইরোবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্যা কনজারভেশন অব নেচার (IUCN)। স্টকহোম কনফারেন্সের ফলে বিশ্বে পরিবেশগত বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (Environmental Agencies)/মন্ত্রণালয় গঠিত হয় এবং অনেক দেশেই জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়।

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ও বিশ্ববাসীকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণে জনমত সৃষ্টির জন্য ১৯৮৮ সালে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (IPCC)। সম্প্রতি আইপিসিসির প্রকাশিত প্রতিবেদন সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন কী হারে ঘটছে এবং করণীয় সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সজাগ করা হয়। আইপিসিসি-কে উক্ত গবেষণামূলক প্রতিবেদনের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বর্তমানে উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে বিশ্ব সম্প্রদায় একজোট হয়ে কাজ করছে।

ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের বিরূপ প্রভাব হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাসেল কনভেনশন, রটারডাম কনভেনশন ও স্টকহোম কনভেনশন গৃহীত হয়েছে এবং এর আওতায় নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষার জন্য গৃহীত হয়েছে মন্ট্রিল প্রটোকল এবং ওজোন স্তর ক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাসের কার্যক্রমও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কিয়োটো প্রটোকল

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে কিয়োটা প্রটোকলের নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে কার্যকর হয়েছে। জুন ২০০৮ পর্যন্ত বিশ্বের ১৮২টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থিত (Ratified) হয়েছে। উল্লেখ্য এ পর্যন্ত ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কিয়োটো প্রটোকল অনুসমর্থিত হয়েছে। শিল্পোন্নত ৩৯টি দেশকে ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে ৬টি গ্রীনহাউজ গ্যাস যথা carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydroflurocarbons, perfluorocarbons এবং sulphur hexafluoride নির্গমণের মাত্রা ১৯৯০ সালের তুলনায় গড়ে ৫.২ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এ প্রটোকলের আওতায় বিশ্বের ৩৬টি দেশকে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের (GHG) মাত্রা ১৯৯০ সনের মাত্রার নীচে নামাতে হবে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০-২০০৪ পর্যন্ত গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনকারী বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ এ দেখা যেতে পারে।

সারণি-১৫.১ বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনের বিবরণ

দেশের নাম	গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনে পরিবর্তন (১৯৯০-২০০৪)	ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (২০১২ সালের মধ্যে)	চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা (২০০৮-২০১২)
জার্মানী	-১৭%	-২১%	-৮%
কানাডা	+২৭%	পাওয়া যায়নি	-৬%
অস্ট্রেলিয়া	+২৫%	-ঐ-	+৮%*
স্পেন	+৪৯%	+১৫%	-৮%
যুক্তরাষ্ট্র	+১৬%	পাওয়া যায়নি	-৭%*
নরওয়ে	+১০%	-ঐ-	+১%
নিউজিল্যান্ড	+২১%	-ঐ-	০%
ফ্রান্স	-০.৮%	০%	-৮%
গ্রীস	+২৭%	+২৫%	-৮%
আয়ারল্যান্ড	+২৩%	+১৩%	-৮%
জাপান	+৬.৫%	পাওয়া যায়নি	-৬%
যুক্তরাজ্য	-১৪%	-১২.৫%	-৮%
পতুর্গাল	+৪১%	+২৭%	-৮%
ইউরোপীয় ইউনিয়ন-১৫	-০.৮%	পাওয়া যায়নি	-৮%
চীন	+৪৭%	-	-
ভারত	+৫৫%	-	-

উৎসঃ ইন্টারনেট

কাজাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থিত হয়নি। চীন এবং ভারত গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও তাদের ক্ষেত্রে ইইউর নির্গমন মাত্রা প্রযোজ্য নয়।

উল্লেখ্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ৫ জুন ২০০৮ এ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে **Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy** এর সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের জন্য প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "**আর নয় কার্বনের বিষ-চাই পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি**'। উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ অত্যন্ত কম মাত্রায় কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস উদগীরণ করে থাকে, যার পরিমান বার্ষিক মাত্র ০.২ টন, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে এর পরিমান বার্ষিক ১.৬ টন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর পরিমান বার্ষিক ২০ টন। কিয়োটো প্রটোকল বনায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রাখছে। কারণ বাতাসের কার্বন শোষণ করে এরূপ কার্যক্রম, যেমন বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণ মাত্রা হ্রাসে সহায়তা করে।

বক্স নং ১৫.১ঃ বৈশ্বিক উষ্ণতাঃ বিপদে উন্নয়নশীল দেশ

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলো। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, এশিয়া ও আফ্রিকার খাদ্যাভাব বেড়ে যাওয়াসহ প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তির আশংকা বাস্তব হয়ে যেতে পারে বিজ্ঞানীদের অনুমিত সময়ের অনেক আগেই। এর ফলে মালদ্বীপসহ বাংলাদেশের মত উপকূলীয় দেশগুলো ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হবে। ২০০৭ এর এপ্রিলের প্রথমার্ধে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আন্তঃ রাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেলের (IPCC) চতুর্থ বৈঠক শেষে এমন আশংকার কথাই জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।ব্রাসেলস বৈঠকে বিশ্বের প্রায় একশরও বেশী দেশের সরকারী প্রতিনিধিরা বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর এ সংক্রান্ত একটি খসড়া নীতিমালা অনুমোদন করেছেন।

জাতিসংঘের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫-২.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (২.৭-৪.৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট) বৃদ্ধি পেলে প্রাণী ও উদ্ভিদের এক তৃতীয়াংশ প্রজাতি হুমকীর সম্মুখীণ হবে। তা ছাড়া এশিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের একশ কোটিরও বেশী লোক ২০৫০ সালের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে বিশেষ করে বাংলাদেশ, মায়ানমার, চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো তলিয়ে যেতে পারে। আফ্রিকা সাব-সাহারা অঞ্চলের খরা আরোও বাড়বে। রিপোর্টে বলা হয় বিশ্বের তাপমাত্রা ২১০০ সালের মধ্যে ১.১ ডিগ্রী থেকে ৬.৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়তে পারে।

Clean Development Mechanism (CDM)ঃ

কিয়োটো প্রটোকলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল Clean Development Mechanism (CDM), যার আওতায় উন্নত বিশ্বের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসের পরিবর্তে উন্নয়নশীল (এনেক্স-বি ভুক্ত ৩৯টি দেশ) দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে 'Certified Emission Reduction' (CER) ক্রেডিট নিজের খাতে জমা করতে পারবে। এর ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশ উপকৃত হতে পারে। ঢাকা মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে Clean Development Mechanism-এর আওতায় ঢাকায় বিভিন্ন বাজার থেকে প্রতিদিন ৭০০ মেঃ টঃ পচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করে কম্পোস্ট সার তৈরী করা হবে। এর ফলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-এর ৭০০ মেঃ টঃ বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের ব্যয় সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি বর্জ্য হতে জৈব সার পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি UNFCCC-এর আওতায় সিডিএম নির্বাহী বোর্ড অনুমোদন করেছে। বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট সার তৈরী করার ফলে প্রতি বছর ৯,০০,০০০ মেঃ টঃ গ্রীন হাউজ গ্যাস উদগীরণ বন্ধ হবে, যা সিডিএম এর আওতায় Certified Emission Reduction (CER) হিসেবে বিক্রি করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবকাঠামো নির্মানের কাজ চলছে। প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় এপ্রিল, ২০০৮ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সিডিএম নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক ১০২২টি সিডিএম প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে। এ সব প্রকল্পের গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমান প্রায় ১৩৬ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাসের সমপরিমাণ। ২০১২ সালের শেষে এর পরিমাণ হবে প্রায় ১২৫০ মিলিয়ন টন। বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী (South South North Network) সহায়তায় বেসরকারি সংস্থা, যেমন বিকাশ, গ্রামীণ শক্তি, এনার্জি প্যাক এবং Waste Concern কয়েকটি CDM প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকার ইতোমধ্যে সিডিএম এর আওতায় বেসরকারি খাতে মোট ১০,৩২,০০০টি Solar Home System (SHS) স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। এসএইচএসগুলো সারা দেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের আওতাবহির্ভূত (off grid) এলাকায় স্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশের পরিবেশগত মূল সমস্যাদি

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে খরা ও বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্যাদির মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার বসতির কারণে বনাঞ্চলে অযাচিত অনুপ্রবেশ এবং ক্ষতিকর শিল্পবর্জ্যের যথেচ্ছ নিক্ষেপণের কারণে ভূমির কার্যকর গুণাবলীর অবক্ষয় ঘটেছে। উপকুলীয় এলাকায় মৃত্তিকায় অবক্ষয় ঘটছে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে। দেশের ভূউপরিস্থ পানি, শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, পৌর এলাকার অপরিশোধিত বর্জ্য পানি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, তৈল বাহিত দূষণ এবং নদীবন্দর ও উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রবন্দর ও জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ড থেকে নিসৃত তৈল জাতীয় পদার্থ দ্বারা ক্রমাগত দূষিত হয়ে চলছে। বাংলাদেশে বর্তমানে, বিশেষ করে চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালীসহ অন্যান্য জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি একটি মারাত্মক জাতীয় সমস্যা।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্তের অপর পার থেকে প্রবাহিত ৫৭টি নদী রয়েছে। এই ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টির ক্ষেত্রে ভারত ও ৩টির ক্ষেত্রে মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ যৌথ অংশীদার। এসব নদীর উজানে সেচ ও অন্যান্য প্রয়োজনে পানি উত্তোলনের কারণে আন্তর্জাতিক সীমারেখার অপর পার হতে আগত নদীসমূহ থেকে পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ এক্ষেত্রে একটি আলোচিত উদাহরণ। গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি উত্তোলনের ফলে বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে খরা পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। এছাড়া ভারতের আন্তঃ বেসিন নদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে বার্ষিক পানি প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে যা দেশের অর্থনীতি, সমাজ এবং পরিবেশের ওপর অপরিসীম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

সমগ্র পৃথিবীজুড়ে মানবসৃষ্ট যে সকল পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে চলেছে, বায়ুদূষণ সেগুলির একটি। বাংলাদেশে বায়ুদূষণের উৎস দু'টিঃ যানবাহন ও শিল্প কারখানা থেকে নিসৃত কালো ধোঁয়া। এ দু'টি উৎস মূলত নগরাঞ্চলে বেশী মাত্রায় বিরাজমান। বায়ু দূষণের অপর উৎস হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে মূলত শুষ্ক ঋতুতে পরিচালিত অসংখ্য ইটের ভাটাও রয়েছে। এ সকল ইটের ভাটায় অধিকাংশ জ্বালানী হিসেবে কয়লা ও কাঠ ব্যবহার করা হয়, যা থেকে নিসরণ হয়ে থাকে সালফার ডাই অক্সাইড ও উদ্বায়ী জৈবযৌগ। বায়ুতে যানবাহন থেকে নিসৃত লেড এর উচ্চমাত্রায় উপস্থিতি নগর ও শহরাঞ্চলে একটি মারাত্মক সমস্যা। মানব স্বাস্থ্য বিশেষ করে শিশু স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক।

মানবসৃষ্ট বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দ্বারা ভূমি, বনাঞ্চল ও জলজ বসতি ধ্বংস ও অবক্ষয়জনিত কারণে জীববৈচিত্র্য নিঃশেষিত হচ্ছে। এ সকল কর্মকান্ড ঘটে চলেছে কৃষি ব্যবস্থা, বনাঞ্চল, মৎস্য সম্পদ, নগরায়ন, শিল্প কারখানা, পরিবহন ব্যবস্থা, পর্যটন, জ্বালানি, রাসায়নিক, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সেক্টরসমূহে। অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিবেশ ব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়া গভীর ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে মৎস্য ও অন্যান্য জলজ জীববৈচিত্র্য।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশে পরিবেশগত বড় ধরণের বিপর্যয় মোকাবেলা করার মতো প্রযুক্তি বা সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একারণে বড় ধরণের পরিবেশগত বিপর্যয় যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য সরকার দেশের পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন

ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। ভূমি, পানি সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশজ উৎপাদে বিশেষ অবদান রাখে। একটি নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে এ তিন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সমন্বয়

সাধন তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকার জুন ২০০১ সালে 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, বাংলাদেশ' অনুমোদন করেছে। ভূমি অবক্ষয় রোধে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য নীতি ও ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি, জাতীয় পরিবেশ আইন ও বিধিমালা, জাতীয় বন নীতি, কৃষি নীতি এবং কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় পানি নীতি

অর্থনৈতিক উন্নয়নে পানি সম্পদ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষত পানি সম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পানি সরবরাহ ও পানি সংক্রান্ত সেবাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ ও স্থানীয় সংস্থাসহ বেসরকারি ব্যবহারকারি ও উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সম্বলিত 'জাতীয় পানি নীতি' ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ওয়ারপোতে জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (NWRD) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ডাটাবেসে এ পর্যন্ত দেশের পানি সম্পদ খাতসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের তথ্য/উপাত্ত ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত ছাড়াও এ ডাটাবেসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মডেল ও বিশ্লেষিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি তাদের পরিকল্পনা ও গবেষণা কাজে NWRD' এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

বায়ু দূষণ মোকাবেলার লক্ষ্যে দেশে বেশ কিছু আইন ও বিধি বলবৎ রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ুদূষণ রোধে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ঢাকা মহানগরীতে দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি হুইলার মটরযান চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিএনজি চালিত ফোর স্ট্রোক থ্রি হুইলার যানবাহন প্রচলন করা হয়েছে এবং সকল প্রকার পেট্রোল চালিত যানবাহনে সিএনজি ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে'র আওতায় ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা শহরে মোট পাঁচ (০৫) টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় বায়ু দূষণ পরিমাপের জন্য দুটি মোবাইল এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন সংগ্রহ করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে জনসংখ্যা, যানবাহনের সংখ্যা, কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দূষণ নিঃসরণ পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে সার্কের অংঙ্গ সংগঠন SACEF-এর ৭ম গর্ভর্ণিং কাউন্সিলের সভায় 'Malé Declaration on Control and Prevention of Air Pollution and its likely Transboundary Effects for South Asia' গৃহীত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর উক্ত ঘোষণাপত্রের আওতায় পর্বভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় একটি Transboundary Air Pollution Monitoring Station স্থাপিত হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে দ্বিতীয় Transboundary Air Pollution Monitoring Station স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় ফসলের ওপর ওজোন (Ozone/O_3) এর প্রভাব নির্ণয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। গবেষণায় ফসলের ওপর ওজোনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ৩টি স্কুলে শিশু স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব নিরূপন বিষয়ক আরও একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বায়ুদূষণ রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জন্য প্রচার

সামগ্রী প্রণীত হচ্ছে। জনসাধারণকে বায়ু দূষণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে। সংশোধিত পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা প্রস্তুত ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সালের তফসিল ২ এ বর্তমান বায়ুর মানমাত্রা সংশোধনপূর্বক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ইট ভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ দূষণরোধকল্পে সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটার বিকল্প হিসেবে কমপ্রেস পদ্ধতির পরিবেশ-বান্ধব ব্লক ইট প্রচলন উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ (সংশোধন ১৯৯২ ও ২০০১) যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর আওতায় ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ (বিধিমালা) ২০০৪ প্রণয়ন করা রয়েছে। দেশের ইটের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের দিক বিবেচনায় রেখে খসড়া ইটভাটা নীতিমালা প্রনীত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন Clean Air Sustainable Environment (CASE) প্রকল্পের আওতায় পরিবেশবান্ধব ইট পোড়ানোর প্রযুক্তি প্রদর্শন ও প্রচারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১০ সালের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতির ইটের ভাটা বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ

দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে মার্চ, ২০০২ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। পাহাড় কাটা বন্ধে এলাকাবাসীর সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলে অবৈধভাবে পাহাড় কাটার প্রবনতা কমে আসছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য কিনা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে পরিবেশ দূষণ সহনীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ইতোপূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর-এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের ইটিপি স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং এ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সেপ্টেম্বর ২০০৭ এ ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক ইটিপি মেলার আয়োজন করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০০২-২০০৫ সালের এক জরিপে ১১,১৪৯ টি শিল্প কারখানার মধ্যে ৫২৪ টি শিল্প কারখানাকে লাল তালিকা ভুক্ত করে। এর মধ্যে ৪১৭ টি শিল্প কারখানা ইটিপি তৈরী করে নিজস্ব উদ্দ্যোগে এবং ১০৫ টি শিল্প কারখানা এর ETP ছিলনা। এছাড়া, ৪টি এনফোর্সমেন্ট দল গঠন করে শিল্প কারখানা পরিদর্শনপূর্বক দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শিল্প দূষণ হ্রাসকল্পে ২০০৬ এর নভেম্বর থেকে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় চারটি দল কাজ করছে । এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫০টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে ।

বৃহত্তর ঢাকা জেলায় শিল্প কারখানার সংখ্যা ও দূষণের মাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ু দূষণ সংশ্লিষ্ট 'সার্ভে এন্ড ম্যাপিং অব এনভায়রণমেন্টাল পলুশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ ইন গ্রেটার ঢাকা এন্ড প্রিপারেশন অব স্ট্র্যাটেজিস ফর ইটস মিটিগেশন' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিল্প-কারখানার সঠিক অবস্থান, ধরণ, আকার, নির্গত বর্জ্যের বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্যমান আইন মেনে কারখানাগুলো পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এ শব্দ দূষণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা থাকায় তা সময়োপযোগী করার জন্য সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসহ সর্বসাধারণের মতামতের আলোকে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালার

আওতায় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক শব্দ দূষণ বিশেষতঃ মাইক এবং উচ্চমাত্রার হর্ণ এর শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের মধ্যে ঢাকা শহরের শব্দ দূষণের মাত্রা বর্তমানে ৯০-১১০ ডেসিবল হতে ৪৫-৫৫ ডেসিবলে হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সকল প্রকার যানবাহনে হাইড্রলিক হর্ণ নিষিদ্ধকরণসহ ঢাকার কয়েকটি সড়কে গাড়ীর হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ করেছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

রিওতে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। বন নীতি ও পরিবেশ নীতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়স্থল হিসেবে দেশে তিন শ্রেণীর সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দেশের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইকো-ট্যুরিজম, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ ৪৫ হাজার হেক্টর এলাকায় ১৭ টি সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকন্তু, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর ও মারজাত বাওর, গুলশান-বারিধারা লেক ও সুন্দরবন এ ৮টি এলাকাকে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার 'প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা' (Ecologically Critical Area-ECA) হিসাবে ঘোষণা করেছে। রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য টাঙ্গুয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর ও জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে।

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস (GEF) এবং UNDP-এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওর' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় অংশগ্রহণমূলক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ৩ টি জেলা, ১০ টি উপজেলা ও ২২ ইউনিয়নে ইসিএ সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, সিলেটের কুশিয়ারা ও জুরী নদীতে ১৩ টি এবং টেকনাফ এলাকায় ২ টি মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে ৫টি NGO জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারকল্পে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে । হাকালুকি হাওরে ৫ টি, কক্সবাজারে ২ টি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে, বায়োডাইভারসিটি সেল গঠন করা করা হয়েছে, ৭০টি গ্রাম সংরক্ষণ দল (VCG) গঠন করে প্রায় ৪০০০ লোকের বিকল্প জীবিকা সৃষ্টির মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের উপর আহরন চাপ কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ২০১টি বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী এবং ১৬৭টি বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি রক্ষার মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্যের উন্নয়নসহ ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীকূলের বাসস্থান ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাখি শিকার রোধ, জলজ উদ্ভিদ লাগানো ও পাখির অভয়ারণ্য তৈরীর কারণে বিভিন্ন হাওরে ফিরে আসছে অতিথি পাখি। ডিসেম্বর ২০০৭ এ হাকালুকি হাওরে জলচর পাখির শুমারিতে ৪১ প্রজাতির ১লাখ ২৬ হাজার ৮৫১টি পাখি দেখা গেছে। এটা ২০০৬ সালের চেয়ে আড়াই গুন বেশী। এ বছর দেশের বৃহত্তম হাওর (আয়তন প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর) হাকালুকিসহ কক্সবাজার, টেকনাফ ও সোনাদিয়া দ্বীপে মোট ৬৬ প্রজাতির পাখি দেখা গেছে। এর মধ্যে ৪৬ প্রজাতির পাখি দেখা গেছে কক্সবাজার, টেকনাফ ও সোনাদিয়া দ্বীপে।

উল্লেখ্য, সুন্দরবনের অংশবিশেষ (পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ) এবং টাঙ্গুয়ার হাওর-কে রামসার এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৭ সনের ৬ ডিসেম্বর ইউনেসকো 'সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান' (Word Heritage site) হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড হাওর ও জলাভূমি এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রচারমুখী বাংলা বর্ষপঞ্জি-১৪১৪ প্রকাশ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম।

ক্লাইমেট চেইঞ্জ কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণকল্পে প্রণীত National Adaptation Programme of Action (NAPA) ডকুমেন্টটি ক্লাইমেট চেইঞ্জ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫ এ কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত ইউএনএফসিসিসি'র ১১ তম কনফারেন্স অব পার্টিজ এর সাইড ইভেন্টে বাংলাদেশের NAPA উপস্থাপিত হয় এবং তা বিভিন্ন মহলের প্রশংসা লাভ করে। প্রণীত NAPA ডকুমেন্টে জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব সংক্রান্ত যে সকল সমস্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বন্যার প্রাদুর্ভাব, লবণাক্ততা ও খরার প্রকোপ বৃদ্ধি, সুপেয় পানির স্বল্পতা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে পানি নিষ্কাশনে সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যাদি মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত NAPA -তে ১৫ টি প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

নোবেল বিজয়ী জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃ সরকার প্যানেল (আইপিসিসি) মনে করে, জলবায়ু বিপর্যয়ে বিশ্বে যে কটি দেশ ও অঞ্চল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে উচ্চতা এবং ঝড়-সাইক্লোন ক্রমেই বাড়তে থাকবে। দেখা দেবে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট, বেড়ে যাবে রোগব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সমস্যাগুলোকে জটিল করবে। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের যে সব ব্যাপক ঝুঁকি রয়েচে তা মোকাবেলার লক্ষ্যে একটি জাতীয় নীতি ও কর্মপকিল্পনা তৈরী করছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রণীত রোডম্যাপ অনুযায়ী নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার খসড়া দাঁড় করানোর কাজ শেষ হবে ২০০৮ সালের অক্টোবর নাগাদ। সরকারের স্বাস্থ্য, জ্বালানি, পানি সম্পদ ও সমাজ কল্যাণ খাতগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে এসব করা হবে। বছর ব্যাপী এসব কাজে টাকা দেবে যুক্তরাজ্য সরকারের বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা বিভাগ (ডিএফআইডি) এবং সার্বিক সহায়তা করবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস)। উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে গত ১০ বছরে ৩/৪ টি বড় ধরণের বন্যা হয়েছে। অল্প সময়ে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড় ধস হয়েছে। অন্যদিকে ঝড় দুর্যোগে উপকূলে মাছ ধরা বিঘ্নিত হচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে শুষ্ক মৌসুমে বঙ্গোপসাগরের লোনাপানি প্রায় ১০০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও বিরুপতা মোকাবেলায় ইউএনএফসিসিসি কর্তৃক এলডিসিএফ (Least Developed Countries Fund) এবং এসসিসিএফ (Special Climate Change Fund) নামে দু'টি তহবিল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এলডিসি তহবিল ও এসসিসি তহবিলে যথাক্রমে প্রায় ১১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৬১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রয়েছে। মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য এলডিসি তহবিল থেকে ১৩.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও এসসিসি তহবিল থেকে ৩৬.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশও এলডিসিএফ এবং এসসিসিএফ থেকে NAPA সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থ প্রাপ্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ৩-১৫ ডিসেম্বর ২০০৭ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত হয় 'United Nations Climate Change Conference'। এ কনফারেন্সে ১০,৮০০ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন হতে অংশগ্রহণ করে। উক্ত কনফারেন্সে COP 13/ MOP 3 এর বৈঠকে Adaptation Fund কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল উক্ত সিদ্ধান্ত অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । আশা করা যায় Adaptation Fund থেকে উন্নয়নশীল দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশী আর্থিক সহায়তা পাবে।

ওজোন স্তর রক্ষা

ওজোন স্তর রক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে এরোসল সেক্টর-এর ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ওডিএস) Phase out করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশে ওডিএস-এর বাৎসরিক ব্যবহার প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া রিফ্রিজারেশন সেক্টরে অহেতুক সিএফসি নির্গমণ রোধকল্পে রিকভারী ও রিসাইক্লিং প্রকল্পের আওতায় সার্ভিসিং শপের মালিক ও টেকনিশিয়ানদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রায় দুই হাজার টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ওডিএস এর আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। National Phase-out Plan প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১০ সালের মধ্যে রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টর থেকে ১০০% সিএফসি ব্যবহার হ্রাস করা হবে।

পাশাপাশি ঔষধ শিল্পে Metered Dose Inhaller (MDIs) প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য CFC-11/12 এর ব্যবহার রোধকল্পে National Transition Stretegy ও একটি Conversion Project মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারাল ফান্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।

ঢাকা সিটি State of Environment রিপোর্ট প্রণয়ন

UNEP এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা শহরের পরিবেশগত সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত Dhaka City State of Environment রিপোর্টটি পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায়, বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে "Bangladesh National Programme of Action for Protection of the Coastal and Marine Environment from Land-based Activities" প্রকাশিত হয়েছে।

ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন

Global Environment Facility (GEF) এর সহায়তায় কার্টেহেনা প্রটোকলের প্রভিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণীত হয়েছে।

হাসপাতাল/ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ

ঢাকা শহরে সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক এণ্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন একযোগে কাজ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরামর্শ/নির্দেশনা অনুসরণে ইতোমধ্যে বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিকে গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং ক্লিনিক্যাল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে বিদ্যুৎ ও জৈব সার উৎপাদনেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। নগরীর বিপুল পরিমাণ বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে সিডিএম প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জাপানের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (JICA)-র সহায়তায় কুষ্টিয়া পৌরসভায় বর্জ্য থেকে Pilot Composting Project Plant স্থাপন করছে।

JICA-র সহায়তায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২০ বৎসর মেয়াদী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) -র সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস, পুনঃ ব্যবহার ও পুনঃ আবর্তন সংশ্লিষ্ট (3R-Reduce, Reuse & Recycle) National Strategy on waste reduce, reuse and recycle শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম

পরিবেশ সংরক্ষণে সকল স্তরের জনগণকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর প্রাথমিকভাবে কার্যক্রমের আওতায় ছাত্র/ছাত্রীদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঢাকাস্থ বিভিন্ন শিশু সংগঠন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত শিশু পত্রিকার সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম শুরু করেছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০০৭ উপলক্ষে ঢাকার শতাধিক স্কুলে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সরকারের মূল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত সাইক্লোন, খরা, ঝড় ইত্যাদির পূর্বাভাস, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) আবহাওয়া সংক্রান্ত স্যাটেলাইট তথ্যাদি এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র' বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত অন্যান্য সংস্থাগুলো হলো ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।

দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ব্যাপক প্রচারনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন, সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিপোর্টিং এর জন্য মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড ঘোষণা, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে ক্ষুদ্রঋণ এর ব্যবহারকল্পে এডভোকেসী কর্মশালার আয়োজন ইত্যাদি। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনটি জাতীয় কমিটি কাজ করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কমিটি ব্যতীত অন্যান্য যে সব কমিটি রয়েছে তা নিম্নরুপঃ

- ► Cyclon Preparedness Program Implementation Board (CPPIB)
- ►Disaster Management Training and Public Awareness Building Task Force (DMTATF)
- ►Focal Point Operation Coordination Group of Disaster Management (FPOCG)
- ►NGO Coordination Committee on Disaster Management (NGOCC)

এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে সমন্বয়, পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

সামুদ্রিক ঝড় সুনামী ও বাংলাদেশ

সুনামী একটি দৈত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ প্রলয়ংকরী সামুদ্রিক ঝড়ের সৃষ্টি সমুদ্রের তলদেশে সৃষ্ট ভূমিকম্প থেকে। সুনামীর মত প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন। তবে সুনামী থেকে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও 'সুনামী সর্তক সংকেত' ব্যবস্থা চালু করা অতীব প্রয়োজন। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পিত ব্যাপক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীতে সুনামী সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় উল্লেখ রয়েছেঃ

(ক) সুনামীর প্রস্তুতির জন্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য হালনাগাদকরণ।

(খ) বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাদি ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে সুনামীর ফলে প্লাবিত ও ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকার মানচিত্র নির্মাণ।

(গ) সুনামীর কারণে উপকূলীয় এলাকায় হুমকীর সম্মুখীন স্কুল, হাসপাতাল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ চিহ্নিতকরণসহ সুনামী পরবর্তী এসব স্থাপনার সক্ষমতা মূল্যায়ন।

(ঘ) সুনামীর ফলে উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণের জীবিকায় (যেমন-মাছ ধরা, পর্যটন) অর্থনৈতিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও মূল্যাবধারণ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগ কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন থানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য স্যাটেলাইটভিত্তিক পূর্ব সতর্কীকরণ যন্ত্র বসাতে যাচ্ছে। পুরকৌশল বিভাগ ও সরকারের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত ভূমিকম্প ও সুনামী বিষয়ক যৌথ প্রকল্পের আওতায় এ সতর্কীকরণ যন্ত্রসমূহ স্থাপন করা হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে এনজিও কার্যক্রম

দেশের পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা এবং পরিবেশ ব্যবস্থা উন্নয়নে আশি'র দশক থেকে সরকারের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে সংগঠিত করার ব্যাপারে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন), সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি), বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস), এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন ম্যানেজম্যান্ট সেন্টার, ওয়েস্ট কনসার্ন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) ইত্যাদি।

পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কতিপয় নীতি ও আইন

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নসহ পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা সৃষ্টি ও আইনগত বাধ্যবাধকতা। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নীতি ও আইন-কানুন তৈরী করা হয়ঃ

পরিবেশ নীতি, ১৯৯২: দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ প্রণয়ন করে। এ নীতিমালার অধীনে কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসহ মোট ১৫টি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫: দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সরকার ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ প্রণয়ন করে। পরবর্তীকালে পরিবেশ আইনের বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়নসহ পরিবেশ দূষণকারীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ এবং বিচার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিবেশ আদালত স্থাপন করার লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ৬ এপ্রিল ২০০০ তারিখে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন ২০০০ বিলটি পাশ হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭: পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ঃ দেশব্যাপী পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তিকল্পে 'পরিবেশ আদালত আইন ২০০০' বলবৎ করা হয়। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে পরিবেশ আদালত গঠিত হয়েছে এবং ঢাকায় একটি আপিল কোর্ট গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান এর বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে ২১৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১১৭ টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে এবং বাকী ৯৯টি মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।

বন অধিদপ্তর

দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষায় বন অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রাচীন। বাংলাদেশ বন বিভাগ-এর জন্মলগ্ন থেকেই মূল উদ্দেশ্য ছিল বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা (Sustained yield Management) । বাংলাদেশের সুন্দরবন যা পৃথিবীর বৃহত্তম Compact ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট (মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার) তার ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে শুরু হয় ১৮৮৪ সাল হতে। অনুরূপভাবে বন বিভাগ চট্টগ্রাম অঞ্চলে বন ব্যবস্থাপনা শুরু করে ১৮৭১ সালে। বন বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বন ব্যবস্থাপনা শুরু করে ১৯২৫ সালে।

২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১. অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত সামাজিক বনায়ন হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ অব্যাহত আছে।
২. সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে ট্রি ফার্মিং ফান্ড (Tree Farming Fund) গঠন করা হয়েছে।
৩. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে, যেমনঃ (ক) বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো পার্ক স্থাপন, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়), (খ) বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলাগড় ও বড়শী জোড়ায় ইকো পার্ক স্থাপন, (গ) দুলাহাজরা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন (ঘ) ধানসিঁড়ি ইকো পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন (ঙ) সুনামগঞ্জ জেলায় রীডল্যান্ড সমন্বিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প (চ) পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটায় ইকোপার্ক স্থাপন, (ছ) অংশীদারিত্বমূলক বন সৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন (জ) শেরপুর জেলার মধুটিলা ইকোপার্ক স্থাপন (২য় পর্যায়) (ঝ) বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাকল্পে সামাজিক বনায়ন এবং (ঞ) আগর বাগান সৃজন (প্রথম পর্যায়) ইত্যাদি।

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বন অধিদপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ১৯৮১ সাল হতে অদ্যাবধি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় মোট চারটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। অদ্যাবধি বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের অধীনে জবর দখলকৃত এবং অবক্ষয়িত বনভূমিতে ৫৬৪৮৪ হেঃ বাগান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া সারা দেশে ৪৭০০০ কিলোমিটার প্রান্তিক ভূমিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্রীপ বাগানও সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত বাগানে প্রায় ৪ লক্ষ ভূমিহীন, দরিদ্র পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বনায়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে মহিলাদের স্বাধীনতায় সামাজিক বাধা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। কাঠ ও জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবেশের উন্নয়ন সাধন ছাড়াও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সামাজিক বনায়নের দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ড সরকারের PRSP এর সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। উল্লেখ্য সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত PBSA (Participatory Benefit Sharing Agreement) এর তথ্যাদি কম্পিউটারে সন্নিবেশ করার জন্য জুন ২০০৬ -এ সমাপ্ত ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় একটি MIS প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বন বিভাগ MIS, GIS এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বন ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করেছে।

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প

বাংলাদেশ বন বিভাগ ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে 'নিসর্গ সহায়তা' শীর্ষক এক নতুন প্রকল্প শুরু করেছে। ৬১৮৫.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচ বছর (২০০৪-০৫ হতে ২০০৮-০৯) মেয়াদি এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে যেটুকু প্রাকৃতিক বন অবশিষ্ট আছে সে প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং অবশিষ্ট বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য একটি টেকসই মডেল উদ্ভাবন করা । বন বিভাগ এটা মনে করে যে, এ প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে প্রকল্পের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততার উপর। তাই বন বিভাগ প্রাকৃতিক বন রক্ষায় জনগণকে সাথে নিয়ে গঠন করছে একটি 'সহ

ব্যবস্থাপনা' (co-management) কাউন্সিল। উক্ত কাউন্সিল প্রাকৃতিক এলাকার মধ্যে ও আশেপাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এবং বন বিভাগ প্রাকৃতিক বন ও প্রকৃতি রক্ষায় একযোগে কাজ করবে। প্রাকৃতিক বন থেকে যদি কোন আয় হয় তা সরকার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী ভাগ করে নেবে। প্রাথমিক অবস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া, হবিগঞ্জের রেমাকালেংগা ও সাতছড়ি, চট্টগ্রামের চুনতি ও কক্সবাজারের টেকনাফ বনাঞ্চলে এ 'সহ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' চালু করা হয়েছে। উক্ত ৫টি রক্ষিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সরকারি বেসরকারি প্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে ৮টি সহ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও ৮টি সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সহ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও বন বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টার প্রভাব ইতোমধ্যে বনাঞ্চলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার মধ্যে বনাঞ্চলে পাখি ও wildlife habitat বৃদ্ধিসহ সবুজের সমারোহ লক্ষণীয়। উল্লেখ্য পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রাকৃতিক বনাঞ্চলেও এ ধরণের কাউন্সিল গঠন করা হবে।

বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন প্রকল্প

বরেন্দ্র অঞ্চল দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। মরুপ্রবণতা, খরা, অনাবৃষ্টি, উচ্চ তাপমাত্রা, ভূ-উপরিস্থ পানির দুষ্প্রাপ্যতা এবং স্বল্প বৃক্ষরাজি বরেন্দ্র এলাকার বৈশিষ্ট্য। কৃষি কাজের মাধ্যমে এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সেচের ব্যবস্থা, ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য সহজে পরিবহন, খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২২৫২.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বিশিষ্ট 'বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত। সার্বিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকায় ফলের চাহিদা পূরণসহ বনায়নের ফলে এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ)

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম একটি জাতীয় উদ্ভিদ সমীক্ষা, সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ গবেষনা প্রতিষ্ঠান। দেশের ঐতিহ্যবাহী গাছপালাসহ যাবতীয় বৃক্ষলতা প্রজাতির সনাক্তকরণ ও এদের নমুনা সংরক্ষণ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের মূল উদ্দেশ্য। বিএনএইচ এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

- **উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রমঃ** চট্টগ্রাম, বান্দরবান, সাতক্ষীরা, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় জুলাই ২০০৭ হতে অদ্যাবধি উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ৮০০ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- **উদ্ভিদ সনাক্তকরণঃ** Taxonomic Studies-এর মাধ্যমে ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় ৮০০ উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক আরো ২০০ প্রজাতির উদ্ভিদ সনাক্ত করেছে। উক্ত জেলাসমূহ থেকে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্ণিত সময়ে Louraceae পরিবারের চেকলিস্ট বাংলাদেশ জার্নাল অব প্লান্ট টেক্সনমিতে প্রকাশিত হয়েছে। Tiliaceae, Moraceae পরিবার check list Bangladesh Journal of Plant Taxonomy তে প্রকাশের জন্য পান্ডুলিপি প্রস্তুতির কাজ চলছে।

এছাড়া বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফ্লোরা এন্ড ফনা অব বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মসূচিটি ২০০৯ সালে শেষ হবে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের বনজ সম্পদের বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বনজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পরিবেশের উন্নয়ন বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা বিএফআরআই-এর প্রধান লক্ষ্য।

উক্ত ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছেঃ-

- বাঁশ-ঝাড় ব্যবস্থাপনা কৌশল
- জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কপিস ব্যবস্থাপনা ও এর আবর্তন কাল পদ্ধতি
- পাহাড়ী ভূমিতে চাষাবাদের বিকল্প ও লাগসই প্রযুক্তি
- উন্নত মানের বৃক্ষ বীজের উৎপাদন ও সংগ্রহ নির্দেশিকা
- ভূমির উপযোগিতা অনুযায়ী বৃক্ষ রোপন
- টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে বাঁশ ও হাইব্রিড একাশিয়ার বংশবিস্তার
- গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ প্রজাতির জন্য লাভজনক আবর্তনকাল নির্ণয়
- আসবাবপত্র ও অন্যান্য কাজে রাবার কাঠের ব্যবহার কৌশল

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

বিএফআইডিসি বাংলাদেশের বনভূমি থেকে বনজ সম্পদ আহরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, রাবার বাগান সৃষ্টি, কাঁচা রাবার উৎপাদন ও বাজারজাতকরাসহ বনজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। কর্পোরেশনের কার্যক্রম দু'টি সেক্টরে বিভক্ত যথা- (ক) শিল্প সেক্টর ও (খ) কৃষি সেক্টর । বিএফআইডিসি'র ৩টি রাবার জোনের ১৬টি রাবার বাগান গত তিনবছর থেকে লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। রাবার বাগানগুলো ২০০৫-০৬ সালে ৩৭৪৫.৩৯ লক্ষ টাকা, ২০০৬-০৭ সালে ২৪০৭.১০ লক্ষ টাকা এবং ২০০৭-০৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ৩১২৮.৯১ লক্ষ টাকা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ বিএফআইডিসি'র আওতাধীন ১৬টি রাবার বাগান থেকে উৎপাদিত রাবার দেশের মোট রাবার চাহিদার প্রায় ৬৪ শতাংশ - ৭০ শতাংশ পূরণ করছে। গুণাগুণ পরীক্ষায় রাবার কাঠ সেগুন কাঠের সমতূল্য বলে গণ্য। বিএফআইডিসি'কে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছেঃ

- জাতীয় রাবার নীতি প্রণয়ন;
- রাবার বাগানসমূহের কারখানা ও ধূমঘর আধুনিকায়ন, রাবার চুরি ও পাচার রোধে সশস্ত্র রাবার গার্ড বাহিনী তৈরী, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মধ্যে ৫৩৩২ একর জমিতে পুনঃ বাগান সৃজন;
- শিল্প ইউনিটসমূহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে উন্নত মানের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র তৈরী করে স্থানীয় চাহিদা মেটানো ও বাজার প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা;
- গ্রামীণ জনপদে বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চল ও মধুপুর গড় অঞ্চলে ব্যক্তি ও সরকারী পর্যায়ে রাবার চাষ সম্প্রসারণ করে হতদরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

পরিবেশ বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ২৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর বিপরীতে মোট ৯৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত এসব প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৪৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৫৩ শতাংশ। উল্লেখ্য ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে উক্ত মন্ত্রণালয়ের ৩১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। এছাড়া চলতি অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এসকল প্রকল্প, কার্যক্রম ও কর্মসূচি ছাড়াও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ পরিবেশ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এর পরিবেশগত প্রভাব যাচাইয়ের শর্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, এর জন্য প্রকল্প দলিলে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়েছে। বনায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অবদান রাখা সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল mrÉz